ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ চব্বিশ পরগণা জেলায় খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য। রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সেই তাঁর 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' নামক আখ্যায়িকা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নাট্যজগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণহেতু মাত্র ৪০ বছর বয়সেই অধ্যাপনাবৃত্তি পরিত্যাগ করেন এবং নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৮। তাঁর প্রথম নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) ঐতিহাসিক নাটক, এটি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ বলে সেকালে প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ পরলোকগমন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকাররূপেই প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও কয়েকখানি উপন্যাসও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাল্পনিক নাটক এবং গীতিনাটক। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'বভ্রুবাহন' (১৮৯৯), 'সাবিত্রী' (১৯০২), 'রঞ্জাবতী' (১৯০৪), 'উলূপী' (১৯০৬), 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'মন্দাকিনী' (১৯২১), 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) প্রভৃতি। ক্ষীরোদপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে—'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পদ্মিনী' (১৯০৬), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৮), 'অশোক' (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯১০), 'আলমগীর' (১৯২১), 'বিদূরথ' (১৯২২) প্রভৃতি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাল্পনিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকের মধ্যে আছে—'রঘুবীর' (১৯০৩), 'খাঁজাহান' (১৯১২),

Scanned with CamScanner

'আহেরিয়া' (১৯১৫), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৯১৭) প্রভৃতি। ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেকগুলি গীতিনাট্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'জুলিয়া' (১৯০০), 'সপ্তম প্রতিমা' (১৯০২), 'বেদৌরা' (১৯০৩), 'পলিন' (১৯০৪), ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'বরুণা', 'ভূতের বেগার', 'বাসন্তী' ও 'দৌলতে দুনিয়া', ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে 'মিডিয়া' ও 'রূপের ডালি এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'বাদসাজাদী' প্রভৃতি।

■ (ক) পৌরাণিক নাটক ঃ

প্রধানত প্রখ্যাত নট-নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ধারা বেয়েই বাংলা নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব। সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন'-এর জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি 'আলিবাবা' নামক গীতিনাটক রচনা করেন। এই নাটকটির অতিশয় সাফল্যই ক্ষীরোদপ্রসাদকে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনাতেও মোটামুটি গিরিশচন্দ্রের ধারাকেই বজায় রাখতে চেয়েছেন। প্রথমদিকে তিনি ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনাতেই ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু নাট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের যে নাট্যবোধ ছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তার অধিকারী ছিলেন না বলেই খুব সার্থক পৌরাণিক নাটক রচনা করেও উঠতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত জনমনোরঞ্জনের দিকেই। এছাড়া তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে পুরাণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভক্তিরস জমাতে পারেননি। তাই সংখ্যাবাহুল্যে তিনি সর্বকালের বাংলা নাটক রচয়িতাদের মধ্যে একজন অন্যতম অগ্রণী পুরুষ হলেও সাহিত্যগুণে তাঁর অধিকাংশ নাটকই নির্দিষ্ট মান স্পর্শ করতে পারেনি।

কিন্তু মঞ্চসাফল্যের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকায় তাঁর বহু নাটকই দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকটির কথা উল্লেখ করা চলে। তিনি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একই সঙ্গে স্ব স্ব 'ভীষ্ম' নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু নাট্যগুণে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' মঞ্চসাফল্য লাভ করতে পারেনি, পক্ষান্তরে বহু দোষত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সম্ভবত অনভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃত নাটকের অনুসরণহেতু তাঁর **সাবিত্রী** নাটকে ভাষার আড়ম্বর ও গুরুভার নাটকের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। চরিত্র-সৃষ্টি বা নাটকীয়তা সৃষ্টিতে তেমন পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

❖ **রঞ্জাবতী ঃ** 'রঞ্জাবতী' নাটকের নামটি এবং কাহিনিটি তিনি নিয়েছেন ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে, কিন্তু অপরাপর চরিত্রের নাম তিনি ইচ্ছামত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এতে অলৌকিকতার যথেচ্ছ অবতারণায় নাট্যরস যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তবে প্রথমদিকে কাহিনি গ্রন্থনে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

❖ **নরনারায়ণ ঃ** 'নরনারায়ণ' ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। মহাভারতের বহুপ্রোক্ত কাহিনি অবলম্বনে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই নাট্যকার এই নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকে দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত দৈবই জয়ী হলেও পাঠক-দর্শকের হৃদয় পুরুষকারের চরণেই সমর্পিত হয়েছে। নাটকের নামকরণে অর্জুন এবং কৃষ্ণের প্রাধান্যই বর্তমান। কিন্তু গোটা নাটক জুড়ে কর্ণ চরিত্রই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের অন্তর্জগতেও প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব—কর্ণের এই চরিত্রটিই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কর্ণ চরিত্র ছাড়া অপর দুটি নারী চরিত্রই বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, একটি দ্রৌপদী, অপরটি কর্ণ-পত্নী পদ্মাবতী। বহু ঘটনার সমাবেশে নাটকটি সংহত রূপলাভ করতে পারেনি, এর গতিও বড়ো মন্থর। তাসত্ত্বেও, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' নাটকটি দীর্ঘকাল যাবৎ দর্শকদের আনন্দ বিধান করে আসছে। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 'নরনারায়ণ'-এর অতিনাটকীয়তা, আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে অভিনয়ে এ

Scanned with CamScanner

নাটক মনে লাগে না। 'নরনারায়ণ'-এর কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটেছে, অবশ্য তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর ছায়া দেখা যাচ্ছে।"

'নরনারায়ণ' নাটকে কর্ণের সংলাপে কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

> ও কি ও সুন্দর, ও কি মধু-রূপ-রেখা।
> ও কি বর্ণ, নবীন নীরদ! ও কি আঁখি—
> আরও মুখর।
>
> —প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

জনারণ্য বনের সমারোহের বর্ণনা ঃ

> এসেছে অপূর্ব এক অতিথি তাহার
> ঘরে। আবাহন নাহি তার, নাহি বিসর্জন।
> গৃহস্বামী বলিলে অতিথি-অতিথি বলিলে
> গৃহস্বামী।
>
> —দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

এই নাটকের ভাষাশিল্প যে অনবদ্য, তা উপেক্ষা করা যায় না।

(খ) ঐতিহাসিক নাটক ঃ

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা'কে বাদ দিলে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক নিয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের যাত্রারম্ভ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচনার ঢেউ ওঠে, তার আগেই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর এই 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়ে এ জাতীয় নাটক রচনার পথপ্রদর্শন করেন। মুঘল বাহিনীর বিরোধিতায় অগ্রসর প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় সেকালে অভিষিক্ত করা হলেও কাহিনিতে বা প্রতাপ চরিত্রে ঐতিহাসিক সত্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না; নাটকটির লক্ষণীয় নাট্যোৎকর্ষও পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত পরবর্তী সবকটি ঐতিহাসিক নাটকই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলন শুরু হবার পর রচিত, অতএব অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই এই সমস্ত নাটকে স্বদেশপ্রেমই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'পদ্মিনী, চাঁদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার, বাংলার মসনদ, বঙ্গে রাঠোর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক বা ইতিহাসভিত্তিক নাটকগুলিতে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বাদেশিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সমকালীন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথাও উল্লেখ করা চলে। উভয়েই সমকালে একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় সমজাতীয় কাহিনি অবলম্বনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেননি, পক্ষান্তরে ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতীয়তাবোধ উদ্বোধনের জন্য অনেক স্থানেই কাহিনি বা চরিত্রকে ইচ্ছামতো গড়ে নিয়েছেন। কাজেই ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকে সর্বত্র ইতিহাসবোধ অক্ষুণ্ণ থাকেনি। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে যে অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের তেমন ভাষা ব্যবহারেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটককে সচেতনভাবেই সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ শুধু মঞ্চ আর অভিনয়ের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এই কারণেই বিষয়গুণে পরাধীনতার যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনরুচির দাবি মিটাতে পারলেও নাট্যসাহিত্যের বিচারে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। 'পদ্মিনী' এবং 'চাঁদবিবি'—উভয় নাটকেই দুটি নারীচরিত্রের নামে নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো নাটকেই নামকরণেই যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়নি, কারণ কোনো ক্ষেত্রেই চরিত্র দুটি কাহিনির কেন্দ্রে অবস্থান করে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। 'পদ্মিনী' নাটকে যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে, তা বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে, মূল চরিত্রের ভিতর তার বীজ ছিল না। 'চাঁদবিবি' নাটকেও মূল কাহিনি নিয়ন্ত্রণে নায়িকার কোনো ভূমিকা নেই; অধিকন্তু এই নাটকে দেশাত্মবোধ উদ্বোধনেরও বিশেষ প্রয়াস লক্ষিত হয় না। 'অশোক' নাটকটিতেও অশোকের অপেক্ষা

Scanned with CamScanner

অপর কয়টি চরিত্রের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে 'অশোক' নাটকটিকে যে মহত্ত্বে উন্নীত করা সম্ভবপর ছিল, লেখক সেই চেষ্টাও করেননি; ফলে একে ঐতিহাসিক নাটকরূপে অভিহিত করার বিশেষ সার্থকতা নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর'। আলমগীর চরিত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ির অসাধারণ অভিনয়ই নাটকটিকে অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তা দান করেছে। নাটকটিতে এমন বহু ঘটনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, সহজ দর্শকদের কাছে যেগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। তবে আলমগীর অর্থাৎ ঔরঙ্গজীবের চরিত্রটি সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকারকে অনেকখানি সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে হয়েছে, কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক নাটকে এই চরিত্রটিকে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ সমগ্রভাবে নাটকটিকে প্রাণসঞ্চার করতে না পারলেও আলমগীর চরিত্রটিকে অপূর্ব করে তুলতে পেরেছিলেন, এরই ফলে নাটকটির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রইল।

(গ) ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কাল্পনিক কাহিনিযুক্ত নাটক ঃ

ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন কিছু নাটক রচনা করেছেন, সাধারণভাবে এগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক বলেই ভ্রম হয়। একটু বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে যে এই নাটকগুলির কোনো কোনোটিতে দু'একটি ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও মূল কাহিনিটি নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। তবে এদের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই কল্পিত কাহিনিমূলক নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে—'রঘুবীর, খাঁজাহান, আহেরিয়া, বঙ্গো রাঠোর' প্রভৃতি। 'রঘুবীর' নাটকটি ক্ষীরোদপ্রসাদের একেবারে প্রথমদিকের রচনা এবং তাই এতে অপরিণতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। অরণ্যচারী ভীল রঘুবীর এই নাটকের নায়ক। নাটকের ঘটনা সংস্থানে অনেক অসঙ্গতি; পদ্যে রচিত অংশও অত্যন্ত দুর্বল। ঘটনায় নাটকীয়তার অবকাশ থাকলেও নাট্যকার তাঁকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। 'খাঁজাহান' নাটকে দু'একটি ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলেও মূল কাহিনিটিতে ঐতিহাসিক কোনো পরিচয় নেই। শুধু তাই নয়, নাট্যকার এমন সমস্ত ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন, যাকে কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। এ ছাড়াও এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যাকে কার্যকারণসূত্রে সম্বন্ধ বলে মেনে নেওয়া যায় না। 'আহেরিয়া' নাটকটিই এ জাতীয় প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত হলেও যথার্থ নাট্যরসমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। এর দু'একটি চরিত্রে কিছুটা উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ চরিত্রই যথার্থভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। নাটকটি মিলনাত্মক এবং প্রধান চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাবটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় পাঠান শাসন যখন চরম দুর্দশায় উপনীত, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণকে উপলক্ষ করে বাঙালির বলবীর্যের পরিচয় দিয়ে রচিত হয়েছে 'বঙ্গো রাঠোর' নাটকটি। নাটকে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি না থাকায় নাটকে অনেক অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর কোনো কোনো চরিত্র বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

(ঘ) গীতিনাট্য ঃ

ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যগুলি একসময় রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গীতিনাট্য 'আলিবাবা' রচনার মধ্য দিয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ বাংলা নাট্যজগতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নৃত্যগীতবহুল 'আলিবাবা' শুধু সেকালেই নয়, একালেও জনপ্রিয়তা সমানভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত অতিশয় প্রাসঙ্গিক বলেই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। "আরব্য উপন্যাসের সুপরিচিত আখ্যানকে অসাধারণ কৌশলে নৃত্যগীতিমুখর অপেরার ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে আবার তার সঙ্গে নাটকীয় বিচিত্র কাহিনির সমাবেশ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা নাটকে অদ্ভুত বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর যুগে তো বটেই, এখনো পর্যন্ত নাটকটির জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে। অসম্ভব অদ্ভুত কাহিনি, রঙ্গকৌতুক, ভাষার মজাদার কায়দা প্রভৃতি এ নাটককে অভিনয়ে

অসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যে লঘুচিত্ততা তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে দোষের কারণ হয়েছে, এই নাটিকায় সেটাই হয়েছে গুণ। তিনি তথাকথিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের বহর কমিয়ে যদি 'আলিবাবা'র মতো আরো খান কতক হাল্‌কা চালের নাটক লিখতেন তাহলে বাংলা নাট্যসাহিত্য লাভবানই হত।" ক্ষীরোদপ্রসাদ আরব্য বা পারস্য উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনি বা সেই জাতীয় কাহিনি অবলম্বন করে গীতিনাট্যগুলি রচনা করেন। এদের গল্প এবং নৃত্যগীতিই একমাত্র আকর্ষণযোগ্য; চরিত্র বা নাটকীয়তার দিকে নাট্যকার একেবারেই নজর দেননি। অনেকটা পৌরাণিক কাহিনির অনুসরণে রচিত 'কিন্নরী' গীতিনাট্যটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'করুণা' এবং 'ভূতের বেগার' গীতিনাটিকে অমৃতলাল বসুর অনুসরণ রয়েছে বলে মনে হয়। এছাড়া 'বেদৌরা, আলাদিন, জুলিয়া, পলিন, মিডিয়া, রূপের ডালি' প্রভৃতি গীতিনাটকগুলির কাহিনি লেখক মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। এদের কোনোটিই খুব উল্লেখযোগ্য পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

Scanned with CamScanner